দৈনিক বাংলা

C58

তারিখ ... 0৪ JUL 198? ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

১৮ই আষাঢ় ১৩৯৪ সং

বাংলাদেশের জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচী

বাংলাদেশ হচ্ছে পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের লোকসংখ্যার পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১০ কোটি ২৯ লক্ষ। দেশের আয়তন হচ্ছে ৫৫ হাজার ৫ শত ৯৮ বর্গমাইল। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আনুমানিক শতকরা ২.৩ ভাগ। যদি এ হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তবে আগামী ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা আবার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। প্রতিকূল বয়স-কাঠামো এবং সন্তান জন্মদানে সক্ষম বয়সী মহিলাদের সংখ্যাধিক্যতা থাকায় এখানে জন্মহার বেশী হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। এখন যা জনসংখ্যা তার শতকরা চল্লিশ ভাগই ১৫ বছর বয়সের নীচে। ফলে, এসব তরুণ তরুণীরা বড় হলে বোধগম্য কারণেই জন্মহার বৃদ্ধি রোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এই জন্মহার বৃদ্ধিজনিত কারণে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। জনজীবনের মান উন্নয়নে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হচ্ছে না। উন্নত স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক কল্যাণের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটছে।

বাংলাদেশ সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে সজাগ। জন্মহার যদি হ্রাস করা সম্ভব হয় তা হলেই দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন সম্ভবপর হবে বলে সরকার মনে করছেন। এর ফলে ব্যক্তিগত জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও নেমে আসবে। সরকার জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে দেশের এক নম্বর সমস্যা হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং তদনুযায়ী যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এই জন্মহার রোধ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেও সরকার বদ্ধপরিকর রয়েছেন।

ষাট দশকের মধ্যভাগ থেকেই সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে চলছেন। আমাদের জনসংখ্যা কর্মসূচীর সাংগঠনিক কাঠামো, কৌশলগত দিক, এবং দেশের উন্নয়ন চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা সব কিছুরই ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী হচ্ছে ব্যাপক ভিত্তিক ও বহুমুখী। এই কর্মসূচী উপজেলা ও আরও নিম্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রতিষেধক প্রদান, মাতা ও শিশু স্বাস্থ্য সুবিধা এবং সর্বোপরি এন আর আর ১ লক্ষ্য অর্জন ও আগামী ২০০০ সালে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' এই প্রত্যাশা নিয়েই কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নীতি, নির্দেশ, কৌশল ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে যাচ্ছেন।

চলতি তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৮৫-৯০) লক্ষ্য হচ্ছে ১৯৯০ সাল নাগাদ বর্তমান জন্মহার শতকরা ১.৮ ভাগে নামিয়ে আনা। এর জন্য বর্তমান জন্মনিরোধক সামগ্রীর ব্যবহার শতকরা ২৯.৮ ভাগ থেকে ৪০ ভাগে বৃদ্ধি করা হবে।

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় কৌশলগত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। এগুলো হচ্ছে :

ক) স্বাস্থ্য, মাতা ও শিশু পরিচর্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ পদ্ধতির একত্রীকরণ করতে হবে এবং তা সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে হতে হবে।

খ) জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সকলকে অবগত করতে হবে যাতে তারা নিজেরাই পছন্দমাফিক যেকোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন।

গ) ছোট পরিবার গঠন এবং সন্তান জন্মদান হ্রাস করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সামাজিক সমর্থন সংগ্রহ এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহের অধিক হারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঙ) উদ্বুদ্ধকরণ যাতে ব্যাপকতর হয় সেজন্য বিভিন্ন শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিতে হবে।

চ) গবেষণা ও মূল্যায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান।

ছ) সমাজভিত্তিক বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি।

পরিকল্পিত সংসার গঠনের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অবশ্যই একটি স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থা। সন্তান জন্মদানে নিয়মিত বিরতি এবং পরিবার সীমিত রাখার লক্ষ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি গ্রহণ প্রতিটি লোকের পছন্দের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের মর্যাদা প্রদানেও সরকার খুবই সচেতন।

এই কর্মসূচী সম্প্রতিকালে আরও গতিশীল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ১৯৮২ সাল থেকে প্রশাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণ করার পর এবং উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার চালু হওয়ার পর এই কর্মসূচীতে নয়া গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। সামাজিক এবং নিম্নতম পর্যায়ের সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণের ফলে স্বাস্থ্য মাতা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের পরিধি আরও ব্যাপকতর হয়ে পড়বে।

সারা দেশব্যাপী স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা প্রদান কর্মসূচীর সমন্বয়সাধন ও জোরদার করার জন্য কাঠামোগত ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং সুযোগের ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৬ সালের শেষে মোট ১৫২৩টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের মধ্যে আরও ১২০০টি নতুন কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবস্থাপক ও কর্মীদের এতদসম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং প্রশাসন ব্যবস্থাপনা আরও জোরদার করে তোলা।

সরকারী কর্মসূচীর পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাসমূহকেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যাতে করে তারাও জনসংখ্যা তৎপরতাকে আরও গতিশীল করে তুলতে পারেন।

বাস্তবভিত্তিক এবং সাফল্য-

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

(৬-এর কঃ পর)

জনক জনসংখ্যানীতি, কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহণের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা ও অঙ্গীকার প্রদানের জন্য বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ১৯৮৭ সালের জাতিসংঘের জনসংখ্যা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এই বিরল সম্মান প্রাপ্তি সমগ্র জাতিকে আজ নিঃসন্দেহে উদ্দীপ্ত করেছে। পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের মনেও এক নয়া অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে। এর ফলে জাতীয় পরিকল্পনার প্রত্যাশা পূরণে তারা আরও উৎসাহ নিয়ে দায়িত্ব পালন করবেন।

উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং সুসমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে ১৯৮৬ সালে জন্মনিরোধক সামগ্রীর ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ২৯.৮ ভাগ হয়েছে। শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী সক্ষম দম্পতি পরিবার পরিকল্পনার অন্তত একটি পদ্ধতির কথা জানেন। নিশ্চয়ই এটা একটা বিরাট সাফল্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার শতকরা ৩.১ ভাগ থেকে নেমে ১৯৮৫ সালে শতকরা ২.৩ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮০ সালে যেখানে জন্মহার ছিল প্রতি ১০০০ জনে ৩৭.৭। মৃত্যুহারও তদনুরূপ প্রতি ১০০০ জনে হয়েছে ১৩ হতে ১৪.৪। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ১৯৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে জন্মহার প্রতি ১০০০ জনে ৩১ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার শতকরা ১.৮ ভাগে নামিয়ে আনা। অর্থাৎ ১৯৮৬ সালে যেখানে ৫৬ লাখ সক্ষম দম্পতি পরিবার পরিকল্পনা অনুসরণ করছেন, সেখানে ১৯৯০ সাল নাগাদ তা বেড়ে দাঁড়াবে ৮২ লাখে।

ফিচার ব্যুরো